আমাদের পরিবেশ

(পঞ্চম শ্রেণি)

বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর । পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

ডি কে ৭/১, বিধাননগর, সেক্টর -২
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

Neither this book nor any keys, hints, comment, notes, meanings, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the Director of School Education, West Bengal. Any person infringing this condition shall be liable to penalty under the West Bengal Nationalised Text Books Act, 1977.

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১২
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৩
তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৪
চতুর্থ সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৫
পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০১৬

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

পর্ষদ-এর কথা

নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণির 'আমাদের পরিবেশ' বইটি প্রকাশিত হলো। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' তৈরি করেন। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ' আমাদের পরিবেশ' বইটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলি তৈরি করার ক্ষেত্রে 'জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫' এবং 'শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯' -এই দুটি নথিকে বিশেষভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা আর অন্বেষণ প্রক্রিয়াকে হাতেকলমে ব্যবহার করার যথেষ্ট পরিসর বইটির মধ্যে রয়েছে। শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দিয়ে কয়েকটি ভাবমূল (Theme)-কে ভিত্তি করে একদিকে যেমন বইটি রচিত, অন্যদিকে শ্রেণিকক্ষের চারদেয়ালের বাইরে যে বিশ্বপ্রকৃতির অবাধ ক্ষেত্র সেদিকেও শিক্ষার্থীর জানা-বোঝাকে সম্প্রসারিত করার প্রয়াস বইটিতে স্পষ্ট। আশা করা যায় বুনিয়াদি স্তরে শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান, সমাজ, ইতিহাস ও ভূগোল শিখনে পঞ্চম শ্রেণির 'আমাদের পরিবেশ' বইটি যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

একদল নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ বইটি প্রণয়ন করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। প্রখ্যাত শিল্পীবৃন্দ বিভিন্ন শ্রেণির বইগুলিকে রঙে-ছবিতে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

'আমাদের পরিবেশ' বইটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হবে। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি কোণে বইটি যাতে যথাসময়ে পৌঁছে যায়, সেই ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার গ্রহণ করবে। বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের মতামত আর পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

ডিসেম্বর, ২০১৬

সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন
ডি-কে ৭/১, সেক্টর ২
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০০৯১

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয়স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক - এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। আমরা এই প্রক্রিয়া শুরু করার সময় থেকেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ (NCF 2005) এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act 2009) এই নথি দুটিকে অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি আমাদের সমগ্র পরিকল্পনায় আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছি।

লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, '... শিখিবার কলে, বাড়িয়া উঠিবার সময় প্রকৃতির সহায়তা নিতান্তই চাই। গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ, মুক্তবায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড, পুঁথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যক নয়।' ('শিক্ষাসমস্যা') 'আমাদের পরিবেশ' পর্যায়ের বইগুলিতে আমরা উদার প্রকৃতির সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের সংযোগ তৈরি করার চেষ্টা করেছি। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রকৃতির সামনে নিয়মিত দাঁড়ায়, আমরা পাঠ্যপুস্তকে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছি। পঞ্চম শ্রেণি-র 'আমাদের পরিবেশ' বইটিতে একটি নির্দিষ্ট বিন্যাস রয়েছে। প্রকৃতি এবং মানবজীবনের বিভিন্ন সম্পর্ক এই বইয়ের মধ্যে বিধৃত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'আমাদের পরিবেশ' পর্যায়ের বইগুলিতে আমরা পরিবেশ পরিচয়ের সূত্রে বিজ্ঞান, ভূগোল এবং ইতিহাসের প্রাথমিক ধারণাগুলিকে সন্নিবিষ্ট করেছি।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তাঁদের নির্দিষ্ট কমিটি বইটি অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দফতর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

ডিসেম্বর, ২০১৬

নিবেদিতা ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০০৯১

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

পুস্তক নির্মাণ ও বিন্যাস

অধ্যাপক অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্যসচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

অধ্যাপিকা রত্না চক্রবর্তী বাগচী (সচিব, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ)

ড. দেবব্রত মজুমদার ড. শীলাঞ্জন ভট্টাচার্য ড. সত্যকিংকর পাল ড. সন্দীপ রায় অনির্বাণ মণ্ডল

দেবাশিস মণ্ডল সুব্রত হালদার সঞ্জয় বড়ুয়া রুবি সরকার তপন কুমার গোস্বামী

পরামর্শ ও সহায়তা

অধ্যাপক এ.কে. জালালউদ্দিন
অধ্যাপিকা মিতা চৌধুরী
বিশ্বজিৎ বিশ্বাস
দেবব্রত মজুমদার
অধ্যাপক সুমন রায়

শিরীণ মাসুদ
পার্থপ্রতিম রায়
ড. ধীমান বসু
নীলাঞ্জন দাস

ড. দেবীপ্রসাদ দুয়ারী
রুদ্রনীল ঘোষ
সুদীপ্ত চৌধুরী
ড. শ্যামল চক্রবর্তী
প্রদীপ কুমার বসাক

পুস্তকসজ্জা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সমীর সরকার

প্রচ্ছদলিপি : দেবব্রত ঘোষ

সহায়তা : বিপ্লব মণ্ডল

বিশেষ কৃতজ্ঞতা : সুব্রত মাজী

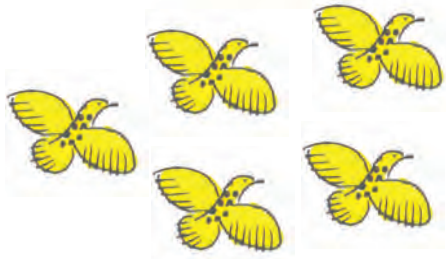

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
মানবদেহ	১-৪৬
ভৌত পরিবেশ (মাটি, জল, জীববৈচিত্র্য)	৪৭-১৪৪
পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ পরিচিতি	১৪৫-২০৩
পরিবেশ ও সম্পদ	২০৪-২৩৫
পরিবেশ ও উৎপাদন (কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন)	২৩৬-২৯০
পরিবেশ ও বনভূমি	২৯১-৩১১

সূচিপত্র

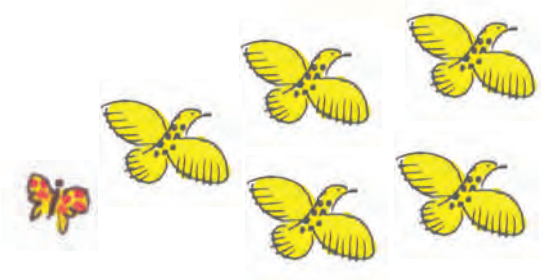

বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিবেশ, খনিজ ও শক্তি সম্পদ	৩১২-৩৩৮
পরিবেশ ও পরিবহণ	৩৩৯-৩৬৩
জনবসতি ও পরিবেশ	৩৬৪-৩৮৭
পরিবেশ ও আকাশ	৩৮৮-৪২০
মানবাধিকার ও মূল্যবোধ	৪২১-৪৪৫
আমার পাতা	৪৪৬-৪৪৭
পাঠ্যসূচি ও নমুনা প্রশ্ন	৪৪৮-৪৬৩
শিখন পরামর্শ	৪৬৪-৪৬৭

এই পাঠ্যপুস্তক বিষয়ে কয়েকটি কথা

আমাদের শিক্ষাপ্রাণালীর রোগনির্ণয় ও তার চিকিৎসা বিষয়ে ১৮৯২ সালে 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন:

"ইহার প্রধান কারণ, বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। ...একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমতো হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে ও স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।"

আমরা রবীন্দ্রনাথের এই রোগনির্ণয় ও চিকিৎসাবিধান মেনে এই 'পাঠ্যপুস্তক' তৈরি করার চেষ্টা করেছি। আমাদের আশা শিশু 'আনন্দের সহিত' এ-বই পড়বে। তাদের নিজেদের মধ্যে যেসব আলোচনা (কথা বলালালি) করতে বলা হয়েছে তা 'আনন্দের সহিত' করবে। শ্রেণিকক্ষে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে তাদের কোলাহল ক্রমে তাদের আনন্দময় দলগত আলোচনায় রূপান্তরিত হতে থাকবে। পাড়ায় ও অন্যদের সঙ্গেও আলোচনা করবে 'আনন্দের সহিত'।

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫-এ বলা হয়েছে **"Intelligent guessing must be encouraged as a valid pedagogic tool. Quite often children have an**

idea arising from their everyday experiences, or because of their exposure to media, but they are not quite ready to articulate it in ways that a teacher might appreciate it. It is in this 'zone' between what you know and what you almost know that new knowledge is constructed. Such knowledge often takes the form of skills, which are cultivated outside the school, at home or in the community. All such forms of knowledge must be respected"

বাড়ির ও পাড়ার শিক্ষিত মানুষদের কাছে তো বটেই, অনেকসময় অনেক নিরক্ষর কাছের মানুষদের থেকেও তারা ধারণা (idea) পাবে। তার আগে ও পরে 'আনন্দের সহিত' এই বই পড়ার ফলে তাদের নতুন জ্ঞান-গঠন প্রক্রিয়া এগিয়ে যাবে। এর ফলে শুধু তাদের 'পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি' পেতে থাকবে এমন নয়, আত্মবীক্ষণ ও পরিবেশবীক্ষণ বিষয়ে তাদের 'গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে ও স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ' করতে থাকবে।

তবে এত কিছু হঠাৎ হবে না। শিক্ষিকা ও শিক্ষক, অভিভাবিকা ও অভিভাবকদের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া এই সাফল্য অর্জন কোনোদিনই সম্ভব হবে না। তাই মুখ্যত তাঁদের উদ্দেশ্যেই এইসব কথা।

শিশুরা শ্রেণিকক্ষে কী করবে, শিক্ষিকা ও শিক্ষকরা কীভাবে তাদের সাহায্যকারী (facilitator) হয়ে উঠবেন তার উদাহরণ বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠায় রয়েছে। বাড়ির লোক ও পাড়ার লোকদের কাছে কী সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে তার উদাহরণও রয়েছে বইয়ের অনেক পৃষ্ঠায়।

হয়তো এরপর আর শিখন-পরামর্শ দরকার হবে না। তবু আমরা জানি, এই পথে আমরা সবাই প্রথম চলতে চাইছি। এত বিস্তৃত ক্ষেত্রে এপথে চলার কোনো অভিজ্ঞতার কথা আমাদের জানা নেই। তাই কিছু শিখন-পরামর্শ বইয়ের শেষে দেওয়া হল। আপনারাও ভাববেন, জানাবেন আপনাদের পরামর্শ।

আসুন, সবাই মিলে আমরা শিশুদের শৈশব কেড়ে না নিয়ে তাকে এমন বইয়ের সঙ্গে পরিচিত করাব যা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'শিক্ষাপুস্তক' নয়, 'পাঠ্যপুস্তক'।

আমাদের পরিবেশ

আমার নাম .....

আমার মায়ের নাম .....

আমার বাবার নাম .....

আমার রোল নম্বর .....

আমাদের বিদ্যালয়ের নাম .....

আমাদের বাড়ির নম্বর ও রাস্তার নাম .....

.....

আমাদের গ্রামের নাম/শহরের নাম .....

আমাদের জেলার নাম .....

শরীরের বর্ম

ব্যাগ কিনতে সুজয় দোকানে গেছে। গিয়ে দেখা হয়ে গেল অণিমা আর ওর মা-এর সঙ্গে। দোকানদার বলছেন— ব্যাগ, জুতো ও বেল্ট সবই চামড়ার। তবে আজকাল চামড়ার অনেক বিকল্পও ব্যবহার হচ্ছে। মানুষও চামড়ার ব্যবহার কমাচ্ছে।

অণিমা ব্যাগটা দেখিয়ে হাসতে হাসতে বলল— চামড়া এত পুরু হয়?

পিছন থেকে সুজয় বলল— হ্যাঁরে, হয়। গন্ডারের চামড়া আরও পুরু!

পরদিন স্কুলে এসব বলল ওরা। দিদিমণি সব শুনে বললেন— জানো তো একসময়ে চামড়ার অনেক রকম ব্যবহার হতো। পশুর চামড়া শুকিয়ে তাতে লিখত মানুষ।

চামড়ার পোশাক, জুতো ব্যবহার করত। জল নিয়ে যেতে চামড়ার তৈরি ব্যাগ ব্যবহার করত। তারপরে মানুষ বোঝে চামড়া বেশি ব্যবহারের বিপদ আছে। পশুরা তো মারা পড়েই। তার সঙ্গে চামড়ার বেশি ব্যবহারে পরিবেশ দূষিত হয়। চামড়া কারখানার নোংরা পড়ে জল নষ্ট হয়। হাওয়ায় দুর্গন্ধ ছড়ায় চামড়ার কারখানা থেকে। তাই আস্তে আস্তে চামড়ার ব্যবহার কমাতে হয়েছে।

রিনা বলল— শরীরে কোনো জায়গার চামড়া টান টান। কোনো জায়গার চামড়া কোঁচকানো। আবার কোথাও চামড়া পুরু, কোথাও পাতলা।

দিদিমণি জানতে চাইলেন— আমাদের শরীরের বর্ম কোনটা বলোত?

সুজয় বলে উঠল— আমাদের চামড়া।

— ঠিক বলেছ। চামড়া বা ত্বক। তার নীচে শরীরের সবকিছু। মাংসপেশি, নার্ভ, শিরা-ধমনি।

পরাণ বলল— দিদি, বর্ম কেন বলব?

সুজয় বোঝাল— আঘাত থেকে বাঁচায় বর্ম। ত্বকও তেমনি। বাইরের আঘাত ও সূর্যের আলোর অদৃশ্য অতিবেগুনি রশ্মি থেকে বাঁচায়।

—চামড়ার নীচে মাংসপেশি, শিরা-ধমনি রয়েছে। ত্বক এদের বাঁচায়। নইলে সামান্য আঘাতেই রক্ত পড়ত। জানত, অনেক দিন আগে যুদ্ধেও চামড়ার ব্যবহার হতো। গণ্ডারের চামড়া দিয়ে পোশাক, ঢাল বানানো হতো। সেই পোশাক পরে যুদ্ধ করলে সহজে আঘাত লাগত না। তাই তাকে বর্ম বলা হতো। ঢালও শরীরকে আঘাত থেকে বাঁচাত। কোনো জায়গা ছড়ে গিয়ে ত্বকে আঘাত লাগলে রোগের জীবাণু সহজেই আক্রমণ করতে পারে।

মীনা বলল—শিরা-ধমনি সব নলের মতো, তাই না?

রফিক নিজের হাতদুটো উপুড় করে মীনাকে দেখাল। বলল— এই দেখ, কীরকম নল দেখা যাচ্ছে। চামড়ার নীচে ফুলে রয়েছে। নলগুলোর শাখাও রয়েছে।

— এগুলো শিরা না ধমনি?

— ওগুলো শিরা। ধমনি একটু ভিতর দিকে থাকে। শরীরের অনেক জায়গায় শিরাগুলো বেশ দেখা যায়।

দেখে নিয়ে লেখো

শরীরের কোন অংশের চামড়া কেমন তা দেখো। তা নিয়ে আলোচনা করো। তারপর লেখো :

শরীরের অংশের	চামড়া কেমন	চামড়ার নীচে আর কী আছে বলে মনে হয়	চামড়ার নীচে শিরা দেখা যায় কিনা
গাল	টান টান		
গলা		দেখা যায়, নীল রঙের	
হাতের তালু			

ত্বক কোথায় পাতলা, কোথায় পুরু

পরদিন। দিদিমণি আসার আগেই ত্বক নিয়ে কথা শুরু হলো।

আমিনা নিজের হাতটা দেখছিল। একসময় বলল— চামড়া যেখানে পাতলা, সেখানেই শিরাগুলো দেখা যায়। চামড়া যেখানে মোটা সেখানে দেখা যায় না। তাই হাতের চেটোর দিকে শিরা দেখা যায় না।

সবাই নিজের নিজের হাতের দু-পিঠ দেখে নিল। আমিনা ঠিকই বলেছে। কিন্তু চামড়া কোথাও পাতলা কোথাও পুরু কেন?

সুজয় বলল— হাতের কোন দিকটায় বেশি ঘষাঘষি হয়?

মীনা বলল— চেটোর দিকটায়।

রফিক বলল— তাই কী হাতের চেটোর দিকের ত্বক মোটা হয়ে গিয়েছে?

ইতু বলল—পায়ের তলার চামড়া আরো পুরু। গোড়ালির কাছটা সবচেয়ে পুরু। গোড়ালিতে কি বেশি ঘষাঘষি হয়?

মীনা বলল— হাঁটার কথা ভেবে দেখ। গোড়ালির উপর শরীরের সব ভার পড়ে। সেখানে বর্মটা মোটা না হলে চলে?

এদিকে সুজন রফিকের হাতের চামড়াটা দু-আঙুল দিয়ে ধরল। বলল—এইভাবে ধরে দেখ, কোথাকার চামড়া কতটা পুরু বুঝতে পারবি।

দেখে নিয়ে লেখো:

শরীরের নানা অংশের ত্বক কত পুরু তা দেখো।

তারপর লেখো :

শরীরের অংশ	ত্বক পাতলা না পুরু	শরীরের অংশ	ত্বক পাতলা না পুরু
গাল	পাতলা		

ত্বকের উপর-নীচ

স্কুলের কাছে এসে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ল সুজন। হাঁটু আর কনুইতে লাগল। সবাই মিলে ধরে তুলে নিয়ে গেল। কনুইতে খানিকটা ছড়ে গেছে। এক জায়গায় একটু রক্ত বেরিয়েছে। হাঁটুতেও একটু ছড়েছে। একটু জল জল কিছু বেরিয়েছে। খানিকক্ষণ বরফ দেওয়া হলো। তারপর হেডস্যার ওষুধ দিলেন।

মীনা সব দেখছিল। সে ভাবল, ত্বকের কি দুটো স্তর আছে? একটা স্তরে জলের মতন কিছু থাকে? আর একটা স্তরে রক্ত? দিদি ক্লাসে এলে সে জানতে চাইল।

দিদি বললেন— ঠিকই দেখেছ। ত্বকের উপরের স্তরে রক্ত থাকে না।

রফিক বলল— ওইস্তরের উপরটা মরা। কেটে গেলেও কিছু হয় না। তাই না?

— হ্যাঁ, ভিতরের স্তরে আঘাত লাগলেই কিন্তু জ্বালা করবে।

মীনা বলল— পুড়ে গেলে খুব জ্বালা করে।

— তখন ঠান্ডা জল দিতে হয়। ধরো কবজির কাছটা পুড়েছে। খানিকক্ষণ ঠান্ডা জলে হাত রেখেছ। হাত তুললে আবার জ্বালা শুরু হলো। তাহলে আবার হাতটা ঠান্ডা জলে ডোবাতে হবে। যখন হাত তুলে নিলে জ্বালা করবে না তখন হাত তুলে নেবে। তাহলে চামড়ার ভিতরের স্তরে ক্ষতি হবে না।

—ফোসকা পড়ে যাবে যে!

— চামড়ার ওপরের স্তরটা গরমে মরে যায়। তখন নীচের স্তরটা থেকে জল বেরিয়ে আসে। দুটি স্তরের মাঝে সেই জলীয় তরল জমা হয়। তার ফলে জায়গাটা ফুলে ওঠে। এভাবে ফোসকা পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গায় ঠান্ডা জল দেওয়া হলে নীচের স্তরটা গরম হতে পারে না। তখন ফোসকা নাও পড়তে পারে।

মীনা বলে উঠল— কিন্তু ফোসকা পড়লেও বেশি ক্ষতি নেই। তাতে চামড়ার ভিতরের স্তরটা বেঁচে যায়।

— বেশি পুড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।

বলাবলি করে লেখো:

আগে কবে কার চামড়ায় আঘাত লেগেছে তা ভেবে আলোচনা করে লেখো :

শরীরের অংশ	চামড়ায় আঘাতের কারণ	তখন কী করেছ	এরপর ওই রকম হলে কী করবে

কোঁকড়ানো আর কালো

স্কুলের একটা অনুষ্ঠানে এসেছেন আগের হেডস্যার। বয়স্ক মানুষ। পিনাকী দেখল, তাঁর মুখের চামড়ায় টানটান ভাব নেই। কপালের চামড়ায় ভাঁজ। পরদিন ক্লাসে স্যারকে এর কারণ জানতে চাইল।

স্যার বললেন— বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শরীর বাড়লে চামড়াও বাড়ে। মোটা হলেও তাই। বৃদ্ধ হলে শরীরটা ছোটো হতে শুরু করে। কিন্তু চামড়া কমে না। তখন চামড়া কুঁচকে যায়। হেডস্যারের তাই হয়েছে।

রিয়াজ বলল— আচ্ছা স্যার চামড়ার রং কেন আলাদা হয়?

—মেলানিন নামের একটা জিনিসের জন্য চামড়ার রং কালো হয়। অতিবেগুনি রশ্মি ত্বকের ক্যানসার ঘটায়। মেলানিন অতিবেগুনি রশ্মি শুষে নিয়ে ক্যানসার আটকায়।

— তাহলে কালো চামড়া রোগের বিরুদ্ধে বেশি লড়াই করতে পারে?

— ঠিক তাই। আর রোদ শরীরে মেলানিন তৈরি করতে সাহায্য করে।

— সাহেবরা তো খুব ফর্সা। তাদের চামড়ায় মেলানিন নেই?

— আছে। তবে কম।

মীনা বলল— আমার বড়োজেঠুর গায়ের রং কালো। কিন্তু এখন অনেক জায়গায় চামড়াটা একদম সাদা হয়ে যাচ্ছে।

— ওসব জায়গায় মেলানিন তৈরি হচ্ছে না। অপুষ্টি বা অসুখে এমন হয়।

— তাহলে গায়ে রোদ লাগানো ভালো?

— হ্যাঁ। ত্বকে রোদ লাগালে ভিটামিন-ডি তৈরি হয়।

স্বপন বলল — স্যার, চামড়া থেকে তো ঘাম বেরোয়।

— ঘামে নুন আর শরীরের কিছু বর্জ্য থাকে। বর্জ্য বেরিয়ে যাওয়াটা ভালো। নুন বেরিয়ে যাওয়াটা খারাপ। বেশি নুন বেরিয়ে গেলে মাথা ঘোরা বা অজ্ঞান হওয়ার ঘটনাও ঘটতে পারে।

রিয়াজ বলল— চাচার খুব ঘাম হয়। ডাক্তারবাবু বলেছেন, একটু নুন জল খেতে।আজ তার কারণটা বুঝলাম।

— তবে জানত, একসময়ে চামড়ার রং দেখে মানুষের ভেদাভেদ করা হতো। বলা হতো, সাদা চামড়ার মানুষরা নাকি সভ্য। কালো চামড়ার মানুষরা নাকি অসভ্য। কালো

চামড়ার মানুষরা নিজেদের সম্মানের জন্য অনেক লড়াই করে। শেষ পর্যন্ত লড়াই করে তারা নিজেদের সম্মান আদায় করেছে। নেলসন ম্যাণ্ডেলা, মহাত্মা গান্ধি, মার্টিন লুথার কিং এঁরা সবাই কালো মানুষদের সম্মানের জন্য লড়েছেন। চামড়ার রং দেখে মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ করা আজকের দিনে অপরাধের শামিল।

বলাবলি করে লেখো

চামড়ার অসুখ বিষয়ে নিজেরা আলোচনা করো। প্রয়োজনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্য নাও। তারপর লেখো :

শরীরের অংশ	চামড়ায় কী অসুখ হয়	সেই অসুখের লক্ষণ	সেই অসুখ হলে কী করেছ বা করবে

চুলের সাতকাহন

কৌশিকের মা চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। চিরুনিতে কিছু চুল উঠে এল। কৌশিক দেখল, চুলের গোড়াগুলো মোটা। ভাবল, চুলের গোড়াগুলো মাথার কোথায় আটকে থাকে? চামড়ার উপরের স্তরে? নাকি ভিতরের স্তরে? নাকি আরও গভীরে?

অনেক প্রাণীর আবার গায়ে লোম বেশি। কিন্তু মাথায় চুল নেই। পাখির গায়ে পালক থাকে। মাছের আছে আঁশ। সাপেরও তাই। আবার ব্যাঙের গায়ে আঁশ, পালক বা লোম কিছুই নেই।

স্কুলে যেতে যেতেই ওরা বন্ধুরা এসব কথাই বলছিল। তৃষা বলল— মুরগির গায়ে কিছু পালক খুব ছোটো। লোমেরই মতো। ওগুলোর গোড়াগুলো চামড়ার নীচের স্তরে সেটা বোঝা যায়।

ক্লাসে এসব কথা বলল সবাই মিলে।

দিদিমণি তৃষার দিকে তাকালেন। হেসে বললেন— তুমি এত সব জানলে কী করে?

—মুরগির গায়ে ওষুধ লাগাতে গিয়ে দেখেছি।

—লোম, চুল,পালক সবেরই গোড়া চামড়ার ভিতরের পর্দায়। চামড়া তো শরীরকে বাঁচায়। আবার চামড়াকেও প্রথম ধাক্কা থেকে বাঁচাতে হবে। তাই লোম, চুল, পালক, আঁশ তৈরি হয়েছে।

তৃষা বলল— মাথা আঁচড়াতে গেলে তো রোজই কিছু চুল উঠে যায়!

— ওঠে তো! পালক, লোম, চুল সবই ওঠে। চামড়া আবার তা তৈরি করে নেয়। তবে রোজ বেশ কিছু চুল স্বাভাবিক নিয়মেই পড়ে যায়।

নবীন বলল— বয়স বাড়লে চুল সাদা হয়ে যায় কেন?

— বয়স বাড়লে মেলানিন তৈরি কমে যায়।

রিনা বলল— কারো চুল কোঁকড়ানো, কারো কোঁচকানো, কারো সোজা!

— দেখো তো তোমাদের মধ্যে কতজনের চুল কেমন। খুঁজলে দেখা যাবে বিভিন্ন মানুষের চুলের রং ও ধরন তোমাদের থেকে অনেকটা আলাদা।

দেখেশুনে লেখো

তোমাদের কার চুল কেমন, কার কত চুল ওঠে তা দেখে আর গুনে লেখো :

চুলের ধরন গড়ে দিনে নিজের কটা চুল উঠে যায়

চুলের ধরন	কোন ধরন, কতজনের	দিন সংখ্যা	সারাদিনে কটা চুল পড়ল	চারদিনে মোট কত চুল পড়ল	গড়ে দিনে কটা চুল পড়ল
কোঁকড়ানো		১			
একটু কোঁচকানো		২			
সোজা সোজা		৩			
		৪			

শজারুর কাঁটা

নীলা কোনো পশুর মাথায় মানুষের মতো চুল দেখেনি। বিড়ালের গোঁফ আর ছাগলের দাড়ি দেখেছে। ওদের গোঁফ-দাড়ি কি মানুষেরইমতন? ওদের গোঁফ-দাড়ি কি পাকে? রিনাকে বলল এসব।

রিনা বলল—ওদের গোঁফ-দাড়ি বেশি বাড়ে না।

ওদের এসব কথা শুনে সুনীল বলল— চুল-গোঁফ-দাড়ি সবার সমান বড়ো নয়। কারো কম বাড়ে, কারো বেশি বাড়ে।

ক্লাসে এসব বলল ওরা। দিদিমণি বললেন — সুনীল তো ঠিকই বলেছে।

সাবিনা বলল—দিদি, কাকাতুয়ার ঝুঁটি কি চুল?

— দেখতে চুলের মতো হলেও পালকই। ওইরকম ঝুঁটির মতো হয়ে তৈরি গন্ডারের খড়্গ। আসলে সেটা চুল।

— চুল কী করে হবে? খড়্গ তো শুনেছি খুব শক্ত।

— শক্ত হলেও জমাট বাঁধা চুল। লোমও শক্ত হয়। বলত কোন প্রাণীর গা-ভরতি শক্ত খাড়া খাড়া লোম?

রফিক বলল— শজারু। শজারুর লোম কাঁটার মতো। খুব শক্ত আর সূঁচাল হয়।

সুনীল বলল — বাদুড়ের গায়েও লোম আছে।